أعوذ باللّٰه من الشيطان الرجيم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

(Book# 88) www.motaher21.net

كُونُوا قَوَّٰمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ

" নিজের বিরুদ্ধে গেলেও ন্যায় সংগত স্বাক্ষ্য দান কর। "

" Stand for justice even against yourselves."

يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّٰمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَٰلِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰٓ أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلْوُۥٓا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

হে মুমিনগণ! তোমরা ন্যায়বিচারে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকবে আল্লাহর সাক্ষীস্বরূপ; যদিও তা তোমাদের নিজেদের বা পিতা-মাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হয়; সে বিত্তবান হোক বা বিত্তহীন হোক আল্লাহ উভয়েরই ঘনিষ্টতর। কাজেই তোমরা ন্যায়বিচার করতে প্রবৃত্তির অনুগামী হয়ো না। যদি তোমরা পেঁচালো কথা বল বা পাশ কাটিয়ে যাও তবে তোমরা যা কর আল্লাহ তো তার সম্যক খবর রাখেন।

১৩৫ নং আয়াতের তাফসীর:

[১] এই আয়াতে মহান আল্লাহ ঈমানদারকে সুবিচার প্রতিষ্ঠিত করার এবং ন্যায় অনুযায়ী সাক্ষ্য দেওয়ার প্রতি তাকীদ করছেন, যদিও তার কারণে তাকে অথবা তার পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনদেরকে ক্ষতির শিকার হতে হয় তবুও। কেননা, সব কিছুর উপর সত্যের থাকে কর্তৃত্ব ও প্রাধান্য।

[২] কোন ধনবানের ধন এবং কোন দরিদ্রের দরিদ্রতার ভয় যেন তোমাদেরকে সত্য কথা বলার পথে বাধা না দেয়। বরং আল্লাহ এদের তুলনায় তোমাদের অনেক কাছে এবং তাঁর সন্তুষ্টি সবার ঊর্ধ্বে।

[৩] অর্থাৎ, প্রবৃত্তির অনুসরণ, পক্ষপাতিত্ব অথবা বিদ্বেষ যেন তোমাদেরকে সুবিচার করতে বাধা না দেয়। যেমন, মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেছেন,[وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا] অর্থাৎ, কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদেরকে যেন কখনও সুবিচার না করাতে প্ররোচিত না করে। সুবিচার কর---। (সূরা মায়েদা ৫:৮)

[৪] تَلْوُوْا শব্দটি لَيٍ ধাতু থেকে গঠিত, যার অর্থ পরিবর্তন করা এবং জেনে-শুনে মিথ্যা বলা। অর্থাৎ, পরিবর্তন-পরিবর্ধন এবং পাশ কাটিয়ে যাওয়া বলতে (সত্য) সাক্ষ্য গোপন করা ও তা পরিত্যাগ করা। এই দু'টি জিনিস থেকেও বাধা প্রদান করা হয়েছে। এই আয়াতে ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করার প্রতি তাকীদ করা হয়েছে এবং এর জন্য যা যা প্রয়োজন তার প্রতি যত্ন নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যেমনঃ-

* সর্বাবস্থায় সুবিচার প্রতিষ্ঠা কর, তা থেকে পাশ কাটিয়ে যেয়ো না এবং কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কার অথবা অন্য কোন চাপ বা প্রবর্তনা যেন এ পথে বাধা হয়ে না দাঁড়ায়। বরং এর প্রতিষ্ঠার জন্য তোমরা একে অপরের সাহায্যকারী হও।

* তোমাদের কেবল লক্ষ্য হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ। যেহেতু এ রকম হলে পরিবর্তন, হেরফের এবং গোপন করা থেকে তোমরা বিরত থাকবে। ফলে তোমাদের বিচার-ফায়সালা ন্যায়-নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হবে।

* ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষতি যদি তোমার অথবা তোমার পিতা-মাতার কিংবা তোমার আত্মীয়-স্বজনের উপর আসে, তবুও তুমি কোন পরোয়া না করে নিজের ও তাদের স্বার্থ রক্ষার তুলনায় সুবিচারের দাবীসমূহকে অধিক গুরুত্ব দাও।

* ধনের কারণে কোন ধনীর খাতির করো না এবং কোন দরিদ্রের প্রতি দরিদ্রতার ফলে মায়া প্রদর্শন করবে না। কেননা, আল্লাহই জানেন তাদের উভয়ের কল্যাণ কিসে আছে?

* সুবিচার কায়েম করার পথে প্রবৃত্তি, পক্ষপাতিত্ব এবং শত্রুতা যেন বাধা না হয়, বরং এ সব কিছুকে পরিহার করে বাধাহীন সুবিচার করো।

যে সমাজে এই সুবিচারের যত্ন নেওয়া হবে, সে সমাজ হবে নিরাপত্তা ও শান্তির আধার এবং আল্লাহর পক্ষ হতে সেখানে অজস্র রহমত ও বরকত অবতীর্ণ হবে। সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) এ বিষয়টিকে খুব ভালোভাবেই হৃদয়ঙ্গম করে নিয়েছিলেন। সুতরাং আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাঃ) সম্পর্কে এসেছে যে, রসূল (সাঃ) তাঁকে খায়বারের ইয়াহুদীদের নিকট পাঠালেন, সেখানকার ফলসমূহ ও ফসলাদি অনুমান করে দেখে আসার জন্য। ইয়াহুদীরা তাঁকে ঘুষ পেশ করল; যাতে তিনি তাদের ব্যাপারে একটু শিথিলতা প্রদর্শন করেন। তিনি বললেন, 'আল্লাহর কসম! আমি তাঁর পক্ষ হতে প্রতিনিধি হয়ে এসেছি যিনি দুনিয়ায় আমার কাছে সব থেকে বেশী প্রিয়তম এবং তোমরা আমার নিকট সর্বাধিক অপ্রিয়। কিন্তু স্বীয় প্রিয়তমের প্রতি আমার

ভালোবাসা এবং তোমাদের প্রতি আমার শত্রুতা আমাকে তোমাদের ব্যাপারে সুবিচার না করার উপর উদ্বুদ্ধ করতে পারবে না।' এ কথা শুনে তারা বলল, 'এই সুবিচারের কারণেই আসমান ও যমীনের শৃঙ্খলা ও ব্যবস্থাপনা সুপ্রতিষ্ঠিত রয়েছে।' (ইবনে কাসীর)

আল্লাহ তা'আলা এখানে মু'মিনদেরকে ন্যায়ের ওপর সর্বদা প্রতিষ্ঠিত থাকতে নির্দেশ দিচ্ছেন। কোন অবস্থাতেই যেন ন্যায় থেকে বিচ্যুত হয়ে ডান-বামে সরে না যায় এবং ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে যেন কোন ভর্ৎসনাকারীর ভর্ৎসনা প্রভাবিত না করে।

(شُهَدَاءَ لِلهِ)

'আল্লাহর সাক্ষীস্বরূপ' অর্থাৎ ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকা ও ন্যায় সাক্ষ্য প্রদান করা যেন একমাত্র আল্লাহ তা'আলাকে খুশি করার জন্য হয়। যদিও এ ন্যায় সাক্ষ্য নিজের পিতা-মাতা ও আত্মীয় স্বজনের বিরুদ্ধে যায়।

(فَاللّٰهُ أَوْلٰى بِهِمَا)

'আল্লাহ উভয়েরই ঘনিষ্ঠতর' অর্থাৎ কোন ধনভাণ্ডারের ধন ও কোন দরিদ্রের দারিদ্রতার ভয় যেন তোমাদেরকে সত্য কথা বলার পথে বাঁধা না দেয়। আল্লাহ তা'আলা তাদের তত্বাবধায়ক, তাদের কল্যাণের ব্যাপারে তিনি ভাল জানেন।

(فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰٓى)

'সুতরাং তোমরা প্রবৃত্তির অনুসরণ কর না' প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না অর্থাৎ প্রবৃত্তির অনুসরণ যেন তোমাদেরকে পক্ষপাতিত্ব বা বিদ্বেষ করতে বাধ্য না করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

(يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَاٰمِنُوْا بِرَسُوْلِهٖ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَّحْمَتِهٖ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ نُوْرًا تَمْشُوْنَ بِهٖ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۭ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ)

“হে মু’মিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আন, তিনি তাঁর অনুগ্রহে তোমাদেরকে দ্বিগুণ পুরস্কার দেবেন এবং তিনি তোমাদেরকে দেবেন আলো, যার সাহায্যে তোমরা চলবে এবং তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।” (সূরা হাদীদ ৫৭:২৮)

আর যদি প্রবৃত্তির অনুসরণ করে সাক্ষ্য বিকৃতি ও পরিবর্তন কর তাহলে জেনে রেখ তোমরা যা কর আল্লাহ তা‘আলা সব জানেন। অতএব সাক্ষ্য ও বিচারের ক্ষেত্রে ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকা সর্বস্তরের মু’মিনদের জন্যই আবশ্যক।

সূরা (৪) নিসা, আয়াত-১৩৫।

☆ আলোচ্য আয়াতে শুধু ইনসাফের নীতি মেনে চল একথাই বলা হয়নি বরং বলা হয়েছে ইনসাফের ধারক হও। কেননা কেবল ইনসাফ করাই আমাদের কাজ নয় বরং ইনসাফের পতাকা উর্ধ্বমুখী রাখাই হচ্ছে আমাদের দায়িত্ব। জুলুমকে নির্মূল করে তদস্থলে ইনসাফ, আদল ও ন্যায়পরায়নতা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। ইনসাফের প্রতিষ্ঠা লাভ করার জন্য যে পৃষ্ঠপোষকতা ও নির্ভরতা আবশ্যক মুমিন হওয়ার কারণে আমাদেরকে সেস্থান গ্রহণ করতে হবে। আমাদের সাক্ষ্যদান একান্তভাবে আল্লাহর জন্য হতে হবে। এতে কে লাভবান হলো বা কে ক্ষতিগ্রস্থ হল সেটা দেখা যাবেনা। বরং এ সাক্ষ্যদান যদি নিজের কিংবা নিজের পিতা-মাতা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন যার বিরুদ্ধেই থাকনা কেন সত্য সাক্ষ্য দিতে হবে। ধনীদের থেকে কোন স্বার্থ হাসিল কিংবা গরীবের প্রতি দয়াও যেন আমাদেরকে সত্যের উপর থেকে বিচ্যুত না করে। আল্লাহই সবচেয়ে বড় দয়ালু। তিনিই সবার জন্য যেটা কল্যাণকর সেটারই ব্যবস্থা রেখেছেন। অতএব আমাদেরকে সত্য এবং শুধুই সত্য সাক্ষ্য দিতে হবে। এমনকি সাক্ষ্য এমন রাখ ঢাক ও ঘুরিয়ে পেচিয়ে দেয়া যাবে না যাতে সত্যটা ঘোলাটে হয়ে যায়, ঢাকা পড়ে যায়। বরং নিরেট সত্যটা উদঘাটন হয় এভাবেই বলতে হবে। আলোচ্য আয়াতে একই সংগে সত্যের উপর অটল থাকার এবং সত্য সাক্ষ্য দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এবং এ পথে যে প্রতিবন্ধকতা তথা মানবীয় দুর্বলতা, ত্রুটি, বিচ্যুতি সেগুলো সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। আল কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের দ্বারা একথা স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে, ইনসাফ ও ন্যায় নীতি প্রতিষ্ঠা ও তার উপর অবিচল থাকা শুধু সরকার ও বিচার বিভাগেরই বিশেষ দায়িত্ব নয় বরং প্রত্যেককে ব্যক্তিগত ভাবেও নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, সে নিজেও যেন ন্যায় নীতির উপর অবিচল রাখার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে।

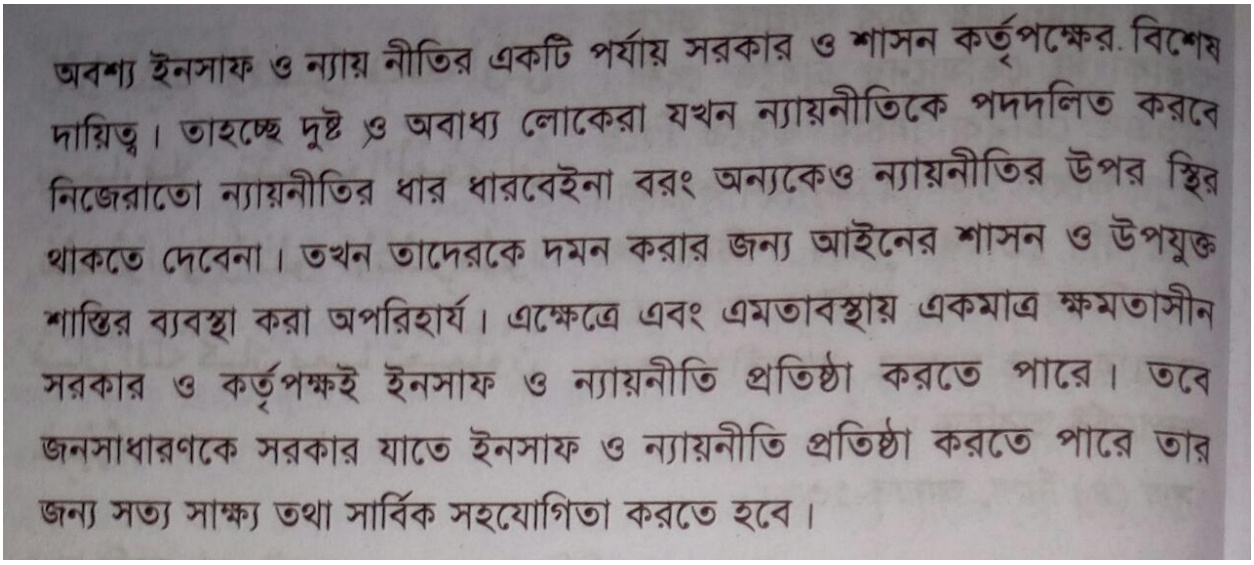

অবশ্য ইনসাফ ও ন্যায় নীতির একটি পর্যায় সরকার ও শাসন কর্তৃপক্ষের বিশেষ দায়িত্ব। তাহচ্ছে দুষ্ট ও অবাধ্য লোকেরা যখন ন্যায়নীতিকে পদদলিত করবে নিজেরাতো ন্যায়নীতির ধার ধারবেইনা বরং অন্যকেও ন্যায়নীতির উপর স্থির থাকতে দেবেনা। তখন তাদেরকে দমন করার জন্য আইনের শাসন ও উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করা অপরিহার্য। এক্ষেত্রে এবং এমতাবস্থায় একমাত্র ক্ষমতাসীন সরকার ও কর্তৃপক্ষই ইনসাফ ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা করতে পারে। তবে জনসাধারণকে সরকার যাতে ইনসাফ ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা করতে পারে তার জন্য সত্য সাক্ষ্য তথা সার্বিক সহযোগিতা করতে হবে।

আয়াত থেকে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. বিচার ফায়সালা ও সাক্ষ্য দানে ন্যায়ের অনুসরণ করা ওয়াজিব।

২. মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া হারাম।

৩. সাক্ষ্য নিজের বিপক্ষে গেলেও সত্য কথা বলা উচিত।

৪. কোন কিছুর লোভ বা ভয় যেন সত্য সাক্ষ্য প্রদান থেকে বিচ্যুত না করে।

يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَـَٔانُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ

হে মু'মিনগণ! তোমরা ন্যায়ের সাক্ষ্যদাতা হিসেবে আল্লাহর পথে দৃঢ়ভাবে দন্ডায়মান থাক, কোন সম্প্রদায়ের প্রতি শত্রুতা তোমাদেরকে যেন এতটা উত্তেজিত না করে যে তোমরা ইনসাফ করা ত্যাগ করবে, সুবিচার কর, এটা তাক্বওয়ার নিকটবর্তী, তোমরা যা কর সে সম্পর্কে আল্লাহ সম্পূর্ণ ওয়াকিফহাল।

৮ নং আয়াতের তাফসীর:

আয়াতের শানে নুযূল:

এ আয়াত নাযিলের ব্যাপারে কয়েকটি বর্ণনা পাওয়া যায়:

১. জাবের (রাঃ) হতে বর্ণিত। (কোন এক সফর থেকে ফেরার পথে) নাবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কোন এক স্থানে অবতরণ করলেন। আর সাহাবাগণ বিভিন্ন গাছের ছায়ায় আরাম করছিলেন। নাবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর তরবারী গাছের সাথে ঝুলিয়ে রেখেছিলেন। এমন সময় হঠাৎ একজন বেদুঈন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর তরবারী নিয়ে কোষমুক্ত করে ফেলল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দিকে অগ্রসর হয়ে বলল: আমার হাত থেকে তোমাকে কে রক্ষা করবে? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: আল্লাহ। এভাবে বেদুঈন কয়েক বার বলল। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রত্যেকবার একই জবাব দিলেন। তখন লোকটির হাত থেকে তরবারী পড়ে গেল। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবীদের ডেকে এ সংবাদ জানালেন। লোকটি পাশে বসা ছিল, কিন্তু কেউ তাকে ভর্ৎসনা করেনি। (সহীহ বুখারী হা: ৪১৩৫)

২. আবূ মালিক (রহঃ) বলেন: আয়াতটি কাব বিন আশরাফের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। যখন কাব ও তার অনুসারীরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও সাহাবাদের ব্যাপারে ষড়যন্ত্র করছিল। কিন্তু আল্লাহ তা‘আলা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে অবগত করে তাদের এ ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দেন। এ ব্যাপারে উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়। এছাড়াও আরো বর্ণনা পাওয়া যায়। (ইবনে কাসীর, অত্র আয়াতের তাফসীর)

সুতরাং যে আল্লাহ তা‘আলা তোমাদের দুর্বলতা দূর করে শক্তি সামর্থ দান করেছেন এবং ভয় দূর করে দিয়েছেন সে আল্লাহ তা‘আলাকে ভয় কর এবং সর্বক্ষেত্রে তাঁরই ওপর ভরসা কর। কারণ তিনি দুর্বলদেরকে সাহায্য করেন এবং যারা তাঁর ওপর ভরসা করে তাকে পূর্ণতা দান করেন।

এমনকি সন্তানদের মধ্যেও সুবিচার করতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম নির্দেশ দিয়েছেন। নুমান ইবন বাশীর বলেন, তার পিতা তাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে এসে বললেন, আমি আমার এ সন্তানকে একটি দাস উপঢৌকন দিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি কি তোমার সকল সন্তানকে এ রকম উপঢৌকন দিয়েছ? তিনি বললেন, না। তখন রাসূল বললেন, তাহলে তুমি তা ফেরৎ নাও। [বুখারী: ২৫৮৬; মুসলিম: ১৬২৩]

এ আয়াতের বিষয়বস্তু প্রায় এসব শব্দেই অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে। পার্থক্য এতটুকু যে, সেখানে বলা হয়েছিল,

(يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ)

[সূরা আন-নিসা: ১৩৫] আর এখানে বলা হচ্ছেঃ

(يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ)

সাধারণতঃ দুটি কারণ মানুষকে ন্যায় ও সুবিচারে বাধা-প্রদান এবং অন্যায় ও অবিচারে প্ররোচিত করে। (এক) নিজের অথবা বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের প্রতি পক্ষপাতিত্ব। (দুই) কোন ব্যাক্তির প্রতি শত্রুতা ও মনোমালিন্য। সূরা আন-নিসার আয়াতে প্রথমোক্ত কারণের উপর ভিত্তি করে সুবিচারের আদেশ দেয়া হয়েছে আর সূরা আল-মায়েদার আলোচ্য আয়াতে শেষোক্ত কারণ হিসেবে বক্তব্য রাখা হয়েছে। সূরা আন-নিসার আয়াতের সারমর্ম এই যে, ন্যায় ও সুবিচারের ক্ষেত্রে নিজের এবং পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনেরও পরওয়া করো না। যদি ন্যায় বিচার তাদের বিরুদ্ধে যায়, তবে তাতেই কায়েম থাক। সূরা আল-মায়েদার আয়াতের সারমর্ম এই যে, ন্যায় ও সুবিচারের ক্ষেত্রে কোন শত্রুর শত্রুতার কারণে পশ্চাদপদ হওয়া উচিত নয় যে, শত্রুর ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্যে সুবিচারের পরিবর্তে অবিচার শুরু করবে। [বাহরে-মুহীত] তাছাড়া সত্য সাক্ষ্য দিতে ত্রুটি না করার প্রতি পবিত্র কুরআনের অনেক আয়াত বিভিন্ন ভঙ্গিতে জোর দিয়েছে। এক আয়াতে অত্যন্ত খোলাখুলিভাবে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, "সাক্ষ্য গোপন করো না। যে সাক্ষ্য গোপন করে, তার অন্তর পাপী"। [সূরা আল-বাকারাহঃ ২৮৩]

আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের সম্বোধন করে বলেন, তোমরা কেবল তাঁর জন্যই হকের ওপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকো এবং ন্যায়পরায়ণতার সাথে সাক্ষ্য দাও। আর কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ যেন তোমাদেরকে অবিচার করতে প্ররোচিত না করে। সর্বদা সকলের সাথে সুবিচার কর, কোনক্রমেই পার্থিব স্বার্থে কিংবা স্বজন-প্রীতি করে অবিচার করবে না, সে শত্র" হোক আর মিত্র হোক। এটাই কল্যাণকর ও তাক্বওয়ার কাজ। এ সম্পর্কে সূরা নিসার ১৩৫ নং আয়াতেও আলোচনা করা হয়েছে।

নাবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট ন্যায্য সাক্ষীর কত গুরুত্ব ছিল, তা এ ঘটনার দ্বারা অনুমান করা যায়। নুমান বিন বাশির (রাঃ) বলেন: আমার পিতা আমাকে কিছু হাদিয়া (দান) দিলেন। তা দেখে আমার মা বললেন: এ হাদিয়ার ব্যাপারে যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে সাক্ষী না রাখবেন ততক্ষণ পর্যন্ত আমি সন্তুষ্ট হব না। এতে আমার পিতা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: তুমি তোমার সব সন্তানদের হাদিয়া দিয়েছ? উত্তরে তিনি বললেন: না। তারপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, আল্লাহ তা'আলাকে ভয় কর এবং সন্তানদের মাঝে সুবিচার কর। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরো বললেন: আমি জুলুমের ব্যাপারে সাক্ষী হতে পারব না।

বর্ণনাকারী বলেন: অতঃপর আমার পিতা ফিরে আসলেন এবং সে হাদিয়া বাতিল করে দিলেন। (সহীহ বুখারী হা: ২৫৮৬)

সুতরাং সত্যের পক্ষে সাক্ষ্য দেয়া, সত্য সাক্ষ্য গোপন না করা এবং মিথ্যাকে সত্য বলে উপস্থাপন না করা ঈমানদারদের বৈশিষ্ট্য। পরীক্ষার নম্বর, সনদ, নির্বাচনে ভোট দান করা এবং কারো বাদী হয়ে পক্ষে কথা বলা সবই সাক্ষ্যের শামিল। সবক্ষেত্রে সততা ও নিষ্ঠার পরিচয় দেয়াটাই হল মু'মিনের একান্ত কর্তব্য।

(يأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ....)

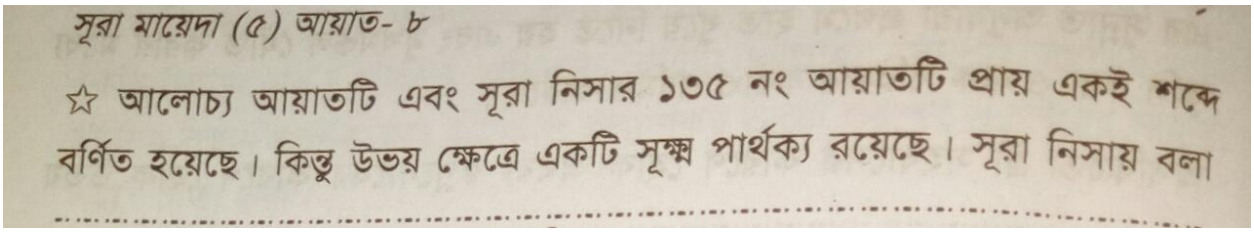
সূরা মায়েদা (৫) আয়াত- ৮

☆ আলোচ্য আয়াতটি এবং সূরা নিসার ১৩৫ নং আয়াতটি প্রায় একই শব্দে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রে একটি সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে। সূরা নিসায় বলা

হয়েছে 'কিসতে সুহাদা লিল্লাহ' আর সূরা মায়েদায় বলা হয়েছে 'লিল্লাহি সুহাদা বিল কিসতে'। একটি শব্দ আগে পিছে করার একটি সুক্ষ্ম কারণ 'বাহরে মুহীত' গ্রন্তে উল্লেখিত হয়েছে- স্বভাবত দু'টি কারণই মানুষকে ন্যায় ও সুবিচারে বাধা প্রদান করে থাকে এবং অন্যায় অবিচারে প্ররোচিত করে। (১) নিজের অথবা আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু বান্ধবের প্রতি পক্ষপাতিত্ব। (২) কোন ব্যক্তির প্রতি শত্রুতা ও মনোমালিন্য। সূরা নিসার আয়াতে প্রথমোক্ত কারণের উপর ভিত্তি করে সুবিচারের আদেশ দেয়া হয়েছে আর আলোচ্য আয়াতে শেষোক্ত কারণ হিসেবে বক্তব্য রাখা হয়েছে। একারণেই সূরা নিসায় বলা হয়েছে ন্যায় বিচারে অধিষ্ঠিত থাক যদিও তা স্বয়ং তোমাদের অথবা তোমাদের পিতামাতা ও আত্মীয় স্বজনের বিরুদ্ধে য়ায়। আর আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে কোন সম্প্রদায়ের প্রতি শত্রুতা যেন তোমাদেরকে ন্যায় বিচার হতে বিরত না রাখে। অতএব সূরা নিসার আয়াতের সারমর্ম এই যে ন্যায় ও সুবিচারের ক্ষেত্রে নিজের এবং পিতা-মাতা ও আত্মীয় স্বজনের পরোয়া করা যাবেনা, যদিও ন্যায় বিচার তাদের বিরুদ্ধে যায় তবুও তাতেই কায়েম থাক। অপরিদকে এই আয়াতের সারমর্ম এই যে ন্যায় ও সুবিচারের ক্ষেত্রে কোন শত্রুর শত্রুতার কারণে পশ্চাদপদ হওয়া উচিত নয়, যা শত্রুর ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্যে সুবিচারের পরিবর্তে অবিচার শুরু করবে। এই কারণে সূরা নিসার আয়াতে কিস্ত অর্থাৎ ইনসাফকে আগে উল্লেখ করা হয়েছে। অবশ্য উভয় আয়াত পরিণামের দিক দিয়ে একই উদ্দেশ্য প্রকাশ করে। কেননা যে ব্যক্তি সুবিচারের জন্য দন্ডায়মান হবে সে আল্লাহর জন্যই দন্ডায়মান হবে এবং সে সুবিচারই করবে। কিন্তু নিজের আত্মীয় স্বজনের প্রতি লক্ষ্য রাখার ক্ষেত্রে এরূপ ধারণা হতে পারে যে এসব সম্পর্কের প্রতি লক্ষ্য রাখাও আল্লাহর জন্যই। তাই এখানে কিসত শব্দ আগে উল্লেখ করে ইংগিত করা হয়েছে যে সুবিচারের বিপক্ষে কারো প্রতি লক্ষ্য রাখা আল্লাহর জন্য হতে পারে না। সূরা মায়েদায় শত্রুদের সাথে ন্যায় বিচারের নির্দেশ দিতে গিয়ে লিল্লাহ শব্দটি অগ্রে এনে মানব স্বভাবের ভাবাবেগের কবল থেকে দূরে রাখা হয়েছে। অর্থাৎ তোমরা আল্লাহর জন্য দন্ডায়মান হয়েছ এর অনিবার্য ফলশ্রুতি হিসেবে শত্রুদের সাথেও ন্যায় বিচার কর। মোট কথা এই উভয় আয়াতে দু'টি কথা বলা হয়েছে (১) শত্রু মিত্র নির্বিশেষে সবার ব্যাপারে ন্যায় ও সুবিচারে অটল থাক। আত্মীয়তার প্রতি লক্ষ্য রেখে অথবা কারো শত্রুতা পরবশ হয়ে এতে দুর্বলতা প্রদর্শন করা উচিত নয়।

(২) সত্যের সাক্ষ্য সত্য কথা প্রকাশ করতে পিছপা হবে না- যাতে বিচারক বর্গসত্য ও বিশুদ্ধ রায় দিতে অসুবিধার সম্মুখীন না হয়।

আজকাল সাক্ষ্যদান তথা শাহাদাত এর যে অর্থ সর্বসাধারনের মধ্যে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে তা শুধু মামলা-মোকাদ্দমায় কোন বিচারকের সামনে সাক্ষ্য দেয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু কুরআনও সুন্নাহর পরিভাষায় শাহাদাত শব্দটি আরো ব্যাপকতর অর্থে ব্যবহৃত হয়। উদাহরণ স্বরূপ- যদি ডাক্তার কোন রোগীকে সার্টিফিকেট দেয় যে, সে কর্তব্য পালনের যোগ্য নয় কিংবা চাকুরী করার যোগ্য নয় অথবা যোগ্য তবে এটিও একটি শাহাদাত। এতে বাস্তব অবস্থার খেলাপ যদি কিছু লিখা হয় তবে তা মিথ্যা সাক্ষ্য দান হয়ে কবিরা গুনাহ অর্থাৎ অত্যন্ত মারাত্মক গুনাহ হবে। এমনিভাবে পরীক্ষার্থীদের লিখিত খাতায় নাম্বার দেয়াও একটি শাহাদাত। যদি ইচ্ছাপূর্বক বা শৈথিল্য ভরে কম বা বেশী নাম্বার দেয়া হয় তবে তাও মিথ্যা সাক্ষ্যের অন্তর্ভূক্ত হারাম ও কঠোর পাপ বলে গণ্য হবে। এমনিভাবে এম. পি., চেয়ারম্যান, মেয়র, কমিশনার, মেম্বার ইত্যাদি জনপ্রতিনিধি নির্বাচনে ভোট দেয়াও একপ্রকার সাক্ষ্য দান। এতে ভোট দাতার পক্ষ থেকে সাক্ষ্য দেয়া হয় যে, আমার মতে এ ব্যক্তি যোগ্যতা, সততা ও বিশ্বস্ততার দিক দিয়ে জাতির প্রতিনিধি হওয়ার যোগ্য। তার চেয়ে যোগ্য কেউ নেই। দুর্ভাগ্যের বিষয় আমাদের জনগণ নির্বাচনকে একটি হারজিতের খেলা মনে করে রেখেছে। একারণে কখনো টাকার বিনিময়ে, কখনো বা চাপের মুখে কখনো বা সাময়িক বন্ধুত্ব এবং সস্তা অংগীকারের ভরসায় একে ব্যবহার করা হয়। এমনকি ধার্মিক বলে পরিচিত লোকও অযোগ্য অধার্মিক ব্যক্তিকে ভোট দিতে গিয়ে একথা চিন্তা করেনা যে, মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ে কবিরা গুনাহ হচ্ছে এবং খোদায়ী অভিশাপ ও শাস্তির উপযুক্ত হয়ে যাচ্ছে। পরিশেষে আবারো আল্লাহপাক তাঁকে ভয় করার জন্য সতর্ক করে দিয়েছেন এবং আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে আমরা যে কারণেই হোক যা কিছু করিনা কেন আল্লাহ অবশ্যই তা জানেন। অতএব আমাদেরকে সর্বাবস্থায় ইনসাফ ও সুবিচারের উপর কায়েম থাকতে হবে এবং সাক্ষ্য দিতে হবে।

আয়াত থেকে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. সর্বদা সকলের ক্ষেত্রে সত্য সাক্ষ্য দেয়া আবশ্যক।

২. কথা, কাজ ও সাক্ষীর ক্ষেত্রে ন্যায়পরায়ণতা অবলম্বন করা জরুরী।

৩. আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করাতে বারংবার গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে।

৪. মু'মিনদের সর্বদা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার ওপর ভরসা করা উচিত।